বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

— সৈয়দ শামসুল আলম

ঐতিহাসিক পটভূমি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মৎস্য একটি অতি প্রাচীন এবং অন্যতম খাদ্য–সামগ্রী। মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিবর্তন পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, প্রাচীন কালের মানুষ প্রথমে মৎস্য অথবা পশু শিকার করে তাদের যাযাবর জীবন যাপন করত। নৃতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন সভ্যতার যে সকল স্থান চিহ্নিত করেছেন, তন্মধ্যে মেসেপটেমিয়া (ইরাক), নীল–নদের উপত্যকা (মিশর) এবং সিন্ধু উপত্যকা (পাকিস্তান) সমূহের সভ্যতা নদীর উপকূল এবং নদীর পানি ভিত্তিক গড়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশ এই উপ–মহাদেশের একটি অন্যতম নদী–বহুল দেশ। সংগত কারণে এদেশের আদি মানুষ মৎস্য শিকার এবং উর্বর প্লাবন ভূমিতে কৃষি কাজ করত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই জন্যই সম্ভবতঃ " মাছে–ভাতে বাঙালী " এই প্রবাদটি যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের উপ–কথায় এবং গল্প–সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে প্রাচীন কালে কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পূর্বে আদি মানুষের প্রথম পেশা ছিল মৎস্য শিকার। বিশেষজ্ঞদের উপরোক্ত মতামতের আলোকে প্রচলিত " মাছে ভাতে বাঙালী " প্রবাদটিতে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

সৎস্য সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বৎসরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা ৫০.১৮ ভাগ কৃষি খাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদ উপ–খাতের অবদান শতকরা ৫ ভাগের অধিক (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৬–৮৭)। মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে ১৯৮৬–৮৭ সনে ৪২২.৩৯ কোটি টাকা অর্থাৎ দেশের সমগ্র রাপ্তানি আয়ের শতকরা ১১ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়েছে (ইকনমিক রিভিউ ১৯৮৭–৮৮)। এই উপ–খাতে বর্তমানে দেশে মোট ১১ মিলিয়ন পূর্ণকালীন এবং খণ্ডকালীন মৎস্য জীবি নিয়োজিত রয়েছে। এরমধ্যে পূর্ণকালীন পেশাজীবি জেলের সংখ্যা ১.১৯ মিলিয়ন এবং খণ্ডকালীন মৎস্য জীবির সংখ্যা ১(এক) মিলিয়ন (পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৮৭)।

গত তিন দশকে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকারী ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন মুখী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এজন্য কোটি কোটি দেশী ও বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করা হলেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের মৎস্য গ্রহণের পরিমান দৈনিক মাথাপিছু প্রয়োজনীয় ৪২ গ্রামের স্থলে ১৯৬৩–৬৪ সনে ৩৩ গ্রাম হতে ১৯৮৪–৮৫সনে ২১ গ্রামে দাঁড়িয়েছে। তথাপি এ দেশের জনগণের অতি প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষ শতকরা ৮০ ভাগ আসে এই মৎস্য থেকে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বাংলাদেশ নদী মাতৃক বিধায় মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রচুর এবং দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণে মৎস্য সম্পদ খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশে বিদ্যমান অফুরন্ত পানি সম্পদে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করে দেশের মোট চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সেই সঙ্গে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান, খাদ্য ঘাটতি পুরণ এবং অবহেলিত মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অর্থনেতিক মুক্তি সম্ভব। মৎস্য সম্পদ বলতে আজ শুধু জেলে, জাল ও মৎস্য শিকার নয়। বর্তমান যুগে মৎস্য শিল্প এক বহুমুখী বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মকাণ্ড। তাই আধুনিক মৎস্য শিল্প বলতে আমরা বুঝি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করণ, আধুনিক ট্রলার, যান্ত্রিক নৌকা, জাল কারখানা, মৎস্য অবতরণ ঘাঁটি, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের হিমাগার, হিমাগার সম্বলিত গাড়ী ও ভ্যান, মৎস্য পরিবহনের সামুদ্রিক জলযান, উন্নত স্বাস্থ্য সম্মত মৎস্য নিলাম কেন্দ্র, পাইকারী মৎস্য বাজার, খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি মৎস্য শিল্পের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৯৮৬–৮৭ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মৎস্য উৎপাদন হয়েছিল ৮ লক্ষ ১৪হাজার মেট্রিক টন। মোট উৎপাদনের চাইতে বেশী পরিমান চাহিদা দেশে থাকা সত্বেও গতবৎসর মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রাপ্তানী করে ৪২২.৩৯ কোটি টাকা আয় করা হয়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝাযায় আমাদের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ভাবে মাছ সম্পদের সাথে জড়িত। এদেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করতে মৎস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের মৎস্যের উৎস্য

বাংলাদেসের মৎস্য প্রাপ্তির এলাকা সমূহকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় যেমনঃ–

(১) অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্র এবং

(২) সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র।

উপরোক্ত এই উৎস গুলোকে বিশেষজ্ঞরা আবার কয়েকটি উপ-ভাগে ভাগ করেছেন। নিম্নের সারণীতে আভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের বিবরণ পেশ করা হলো।

আভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্র (ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ) ১৯৮৫-৮৬

সারণী-১

(ক) উন্মুক্ত জলাশয়ঃ-

উৎসের নাম	আয়তন (হেকটর)	শতকরা হারে	উৎপাদন (মেঃ টন)	শতকরা হারে
(১) নদী ও মোহনা	১০,৩১,৫৬৩	২৪.২৫	২,০৭,৭৬৬	২৭.৫২
(২) বিল	১,১৪,১৬১	২.৬৮	৫১,৩৭৩	৬.৮১
(৩) কাপ্তাই হ্রদ	১,৬৮,৮০০	১.৬১	৪,০৫৭	০.৫৩
(৪) প্লাবন ভূমি	২৮,৩২,৭৯২	৬৬.৬০	২,০৫, ৬১৬	২৬.৫৮
মোট	৪০,৪৭,৩১৬	৯৫.১৪	৪,৬৩,৮১২	৬১.৪৪

(খ) চাষাধীন জলাশয় ঃ-

(১) পুকুর ও দীঘি	১,৪৮,৩৪৬	৩.৪৮	১,০৯,৩৩৩	১৪.৪৮
(২) বাওর সমূহ	৫,৪৯৯	০.১৫	৮৬২	০০.১১
(৩) চিংড়ি খামার	৫৯,৮১২	১.২৪	৮,২১৯	০১.০৮
মোট	২,০৫, ৬৪৬	৪.৮৬	১,১৮,৪১৪	১৫.৬৭
সর্ব মোট (ক+খ)	৪২,৫২,৯৬২	১০০	৫,৮২,২২৬	৭৭.১১

উৎস ঃ- পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৭-৮৮

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের পরিমান ৪২,৫২,৯৬২ হেক্টর এবং দেশের সামগ্রীক উৎপাদনের (৫,৮২,২২৬ মেঃ টন) ৭৭.১১ ভাগ মৎস্য পাওয়া যাচ্ছে এই উৎস থেকে। বাংলাদেশে উন্মুক্ত জলাশয়ের মোট আয়তন ৪০,৪৭,৩১৬ হেক্টর, শতকরা হারে মোট আয়তনের ৯৫.১৪ ভাগ। এর মধ্যে প্লাবন ভূমি মোট আয়তনের ৬৬.৬০ ভাগ, নদী ও মোহনা ২৪.২৫, বিল এবং বিল জাতীয় এলাকা ২.৬৮ এবং কাপ্তাই হ্রদ ১.৬১ ভাগ।

১৯৮৫–৮৬ সালে উক্ত ক্ষেত্র সমূহে মোট ৪,৬৩,৮১২ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে। যা শতকরা হিসাবে মোট উৎপাদনের ৬১.৪৪ ভাগ। এর মধ্যে নদী ও মোহনায় ২৭.৫২ (২,০৭,৭৬৬ মেঃ টন) প্লাবন ভুমিতে ২৬.৫৮ (২,০০,৬১৬ মেঃ টন) বিল এলাকায় ৬.৮০ (৫১,৩৭৩ মেঃ টন) এবং কাপ্তাই হ্রদে ০.৫৩ (৪,০৫৭ মেঃ টন) ভাগ।

অপরদিকে অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের চাষাধীন জলাশয়ের মোট আয়তন ২,০৫,৬৪৬ হেক্টর অর্থ্যৎ শতকরা হারে মোট আয়তনের ৪.৮৬ ভাগ। এর মধ্যে পুকুর ও দীঘি ৩.৪৮(১,৪৮, ৩৪৬ হেক্টর), চিংড়ি এলাকা ১.২৪ (৫১,৮১২ হেক্টর) , এবং বাওর সমূহ ০.১৫ (৫, ৪৮৮৮ হেঃ) ভাগ। ১৯৮৩–৮৪ সালে চাষাধীন জলাশয়ে ১,১৮,৪১৪ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যা আভ্যন্তরীণ মৎসের মোট উৎপাদনের শতকরা হিসাবে ১৫.৬৭ ভাগ। এর মধ্যে ১৪.৪৮ (১,০৯,৩৩৩ মেঃ টন) ভাগ পুকুর ও দীঘিতে, ০১.০৮(৮,২১৯ মেঃ টন) ভাগ চিংড়ি খামারে এবং ০০.১১ (৯৬২ মেঃ টন) বাওর সমূহে।

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তে রায়মঙ্গল থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরে ৭২০ কিলোমিটার (৪৫০মাইল) দীর্ঘ এলাকায় বিপুল পরিমান মাছ বিচরণ করে থাকে। ১৯৭৯ সালে জেনেভা সম্মেলনে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুসারে বাংলাদেশ তার উপকূল থেকে ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল) গভীর সমুদ্র পর্যন্ত এলাকা সার্বিকভাবে ব্যবহার (এক্সক্লুসিব ইকনমিক জোন) করার ক্ষমতা রাখে। বঙ্গোপসাগরের সহীসোপানের (কন্টিন্যানটাল সেল্‌ফ) মোট পরিমান হচ্ছে ৬,০০০,০০(ছয় লক্ষ) বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে বাংলাদেশ বরাবর সহীসোপানের পরিমান হচ্ছে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) বর্গ কিলোমিটার।

১৯৬৯–৭০ সালে ফাও; ইউএনডিপি, এবং মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় এক জরীপে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উপরোক্ত এলাকা সমূহে রয়েছে এক বিরাট মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র। এই মৎস্য ক্ষেত্রের ৪৭৫ টি প্রজাতির মধ্যে ১৩২ টি আবিস্কৃত হয় এই এলাকায় এবং এর ৪২ টি প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে চিংড়ি মাছই রয়েছে ১৮ প্রকারের। উক্ত প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ বঙ্গোপসাগরে ৪টি মৎস্যক্ষেত্রের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

মৎস্য ক্ষেত্রগুলোঃ-

(১) বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র

নদীর মিঠা পানি এবং সমুদ্রের লবনাক্ত মিশ্রণ এবং জোয়ার ভাটা এই ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট। পানির গভীরতা কম বলে এই এলাকা মৎস্য প্রজননের জন্য খুবই উপযোগী।

(২) দক্ষিণ পশ্চিম মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র

এখানে গভীরতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশী। বাণিজ্যিক দিক থেকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। মাছের মধ্যে গ্রাল্টার, ক্যাটফিস এবং কাপার উল্লেখ যোগ্য।

(৩) নিমগ্ন মহা সাগরের বিচরণ ক্ষেত্র

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান অথচ অধিক পরিমানে মাছ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ জনকভাবে পাওয়া যায়।

(৪) নিমগ্ন মহাগহ্বরের পূর্ব দিক

এখানে পানির গভীরতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। ফলে গভীর সমুদ্রে মাছ চাষের জন্য ক্ষেত্রটি অধিকতর উপযোগী এবং বৎসরের সব সময় পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশ। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই বিপুল পরিমান মৎস্য ক্ষেত্রে আমরা দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র ২২ .৯ ভাগ মৎস্য পাচ্ছি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সরকারী উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিশাল এই মৎস্য ক্ষেত্র হতে বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে কয়েকশত গুণ বেশী মৎস্য উৎপাদন করা সম্ভব। নিম্নে সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন (১৯৮৫–৮৬) দেখা যেতে পারে ঃ-

সারণী–২

উৎস	উৎপাদন	শতকরা
১। বাণিজ্যিক ভিত্তিক (যান্ত্রিক বড় ট্রলার দ্বারা ধৃত)	১৯,৪৮৪	২.৫৮
২। ক্ষুদ্র জেলেদের দ্বারা ধৃত	১,৫৩,০০০	২০.২৭
মোট	১,৭২,৪৮৪	২২.৮৫

উৎসঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৮৭–৮৮

মৎসের উৎপাদন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মৎস্য আমাদের খাদ্যে এবং পুষ্টিতে আবহমান কাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মৎস্যই এই অঞ্চলের জনগনের খাদ্য এবং পুষ্টিতে সবচেয়ে মূল্যবান প্রাণিজ প্রোটিন জুগিয়ে আসছে। দেশের ক্রম বর্ধমান জন সংখ্যার চাপে মৎস্যের চাহিদা বাড়ছে কিন্তু মৎস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমান অতি নগণ্য (স্মারণী–৩)। এর ফলে জনপ্রতি মৎস্য সরবরাহ ও ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে।

সারণী–৩

অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টন)

বৎসর	অভ্যন্তরীণ	শতকরা	সামুদ্রিক	শতকরা	মোট
১৯৬৫–৬৬	৭২০	৮৯.৮৯	৮১	১০.১১	৮০১
১৯৭০–৭১	৭২৯	৮৯.৫৬	৮৫	১০.৪৪	৮১৪
১৯৭৫–৭৬	৫৪৫	৮৫.১৬	৯৫	১৪.৮৪	৬৪০
১৯৮০–৮১	৫২৫	৮০.৭৭	১২৫	১৯.২৩	৬৫০
১৯৮৫–৮৬	৫৮৭	৭৩.১২	২০৭	২৬.০৭	৭৯৪
১৯৮৬–৮৭	৫৯৭	৭৩.৩৪	২১৭	২৬.৬৬	৮১৪

উৎসঃ মৎস্য বিভাগ, ১৯৮৮–৮৯

ওপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনের পরিমান ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল ৭২০ হাজার মেট্রিক টন, গত ২০ বৎসর পরেও আমরা সেই ১৯৬৫-৫৫ সালের সমপরিমান মৎস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হই নাই। তবে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমান গত ২০ বৎসরে আড়াই গুণ বেড়েছে। গত ১৯৮৬-৮৭ সালে অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য মিলে মোট উৎপাদন মাত্র ৮,১৪,০০০ (আট লক্ষ চৌদ্দ হাজার) মেট্রিক টন অর্থাৎ ১৩ হাজার টন বেশী।

মৎসের চাহিদা ও উৎপাদন

পৃথিবীতে জনপ্রতি গড়ে দৈনিক মৎস্য ব্যবহারের পরিমান যেখানে ৩২ গ্রাম সেখানে বাংলাদেশে গড়ে জনপ্রতি দৈনিক ১৯৮০ সনের গোড়ার দিকে নেমে এসেছে মাত্র ২০ গ্রাম (এম, পি, ও; ১৯৮৪) । এই কমে যাওয়া প্রোটিনের পরিমান অন্য কোন উৎস যেমন মাংস, দুধ এবং ডিম থেকে প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। মৎস্য মোট জৈব প্রোটিনের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ভাগ সরবরাহ করে এবং এই পরিমান আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি ইনষ্টিটিউট মৎস্যের ব্যবহার আরো শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। যাতে বর্তমানে মৎস্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট প্রোটিনের শতকরা ৬ ভাগের স্থলে ১০ ভাগে উন্নীত করা যায়। নিম্নের সারণীতে (সারণী- ৪) ১৯৮০ সন থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংগে মৎস্যের ব্যবহার ও চাহিদার তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। এই চিত্রের মাধ্যমে মৎস্য সম্পর্কে তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমটি হল বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মৎস্যের উৎপাদন যদি আগামী ২০১০ মণ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনপ্রতি মৎস ব্যবহারের পরিমাণ কোথায় এসে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিকটি হল অপরিবর্তনীয় মৎস ব্যবহারের পরিমাণ জনপ্রতি ২০.১ গ্রাম রাখতে হলে আমাদের উৎপাদন কতটুকু বাড়াতে হবে এবং বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুসারে জনপ্রতি মৎসের ব্যবহার ২০.১ গ্রাম থেকে ৩৮.০ গ্রামে উন্নীত করতে উৎপাদন কত পরিমাণ বাড়াতে হবে।

স্মারণীঃ ৪ঃ

বাংলাদেশে মৎস্যের জনপ্রতি ব্যবহার ও মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ঃ তিন পর্যায়ের চিত্র অপরিবর্তনীয় মৎস্য উৎপাদন (১৯৮০ সন ভিত্তি হিসাবে)

বৎসর	জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	মৎস্য ব্যবহার জনপ্রতি দৈনিক (গ্রাম ব্যবহার)	মৎস্য উৎপাদন (০০০ মেট্রিক টন)
১৯৮০	৮৮.৭	২০.১	৬৫০
১৯৮৫	৯৮.১	১৮.২	৬৫০
১৯৯০	১০৮.৫	৯৫.৪	৬৫০
১৯৯৫	১১৮.৩	০.১	৬৫০
২০০০	১২৭.৯	৯৩.৯	৬৫০
২০০৫	১৩৭.৯	১২.৯	৬৫০
২০১০	১৪৭.৬	১২.১	৬৫০
২. অপরিবর্তনীয় মৎস্য ব্যবহার			
১৯৮০	৮৮.৭	২০.১	৬৫০
১৯৮৫	৯৮.১	২০.১	৭২০
১৯৯০	১০৮.৫	২০.১	৭৯৬
১৯৯৫	১৯৮.৩	২০.১	৮৬৮
২০০০	১২৭.৯	২০.১	৯৩৮
২০০৫	১৩৭.৯	২০.১	১০১২
২০১০	১৪৭.৬	২০.১	১০৩৮
৩. সুপারিশকৃত পর্যায়ে বর্ধিত ব্যবহার			
১৯৮০	৮৮.৭	২০.১	৬৫০
১৯৮৫	৯৮.১	২২.২	৭৯৫
১৯৯০	১০৮.৫	২৩.৭	৯৩৯
১৯৯৫	১১৮.৩	২৭.৬	১৯৯১
২০০০	১২৭.৯	৩০.৯	১৪৪৩
২০০৫	১৩৭.৯	৩৪.৭	১৭.৪৫
২০১০	১৩৭.৬	৩৮.০	২০৮৭

উৎসঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী সমূহ ও এম, পি, ও, ১৯৮৭

সারণী (৪) থেকে দেখা যায় যে যদি মৎস্য উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকে তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রতি দৈনিক মৎস্য ব্যবহার ক্রমনুয়ে কমে ২০১০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১২.১ গ্রামে। আবার মৎস্য ব্যবহার অপরিবর্তিত রাখলে ২০১০ সাল নাগাদ মৎস্যের প্রয়োজন হবে ১০৩৮ হাজার মেট্রিক টন। অপরদিকে খাদ্য ও পুষ্টি ইনষ্টিটিউট কর্তৃক সুপারিশকৃত মৎস্য সরবরাহ করতে হলে ২০১০ সালে মৎস্যের প্রয়োজন হবে ২০৪৭ হাজার টন, যা কিনা বর্তমান উৎপাদন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় অসম্ভব বলেই ধারণা করা যায়।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সম্ভাব্যতা

বর্তমানে দেশের উৎপাদিত মৎস্যের শতকরা ৭৭ ভাগেরও বেশী অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে সংগৃহীত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয়কে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় যেমনঃ (১) উন্মুক্ত (২) বদ্ধ ও (৩) উপকূলীয় জলাশয়। নদী, প্লাবনভূমি পানি সেচ খাল ও নিম্নাঞ্চল (বিল ও হাওর) উন্মুক্ত অঞ্চলের অন্তর্গত।

উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রধানতঃ নদীর মাছের চলাচলের প্রকৃতি ঋতুভিত্তিক মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত। মৎস্যের চলাচল এবং অভিগমন নদীতে স্রোতের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলেই বৎসরের অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে কিন্তু বর্ষা ঋতুতে মৎস্য প্লাবনভূমি মৎস্যের প্রজনন, স্বল্প সময়ে বর্ধন ও উৎপাদনের সবচেয়ে সুবিধাজনক স্বাভাবিক বাসস্থান।

দুঃখের বিষয় উন্মুক্ত জলাশয়গুলি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের চাপে পরিবর্তিত হচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচের ক্রমবর্ধমান কর্মসূচী আমাদের সম্পূর্ণ পানি ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং মোট প্লাবনভূমি ও নদী অঞ্চলের পরিমান ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং জলাশয়গুলির গুণগত মানেরও ক্রমাবনতি ঘটছে। বাংলাদেশের উন্মুক্ত পানি অঞ্চল থেকে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ সারণী ৫–এ দেওয়া হলোঃ–

সারণী-৫

জলাশয়ের প্রকারভেদ নিরূপিত (এষ্টিমেটেড) মৎস উৎপাদন

জলাশয়ের প্রকার	আয়তন (০০০ হেক্টর)	নিরুপিত উৎপাদন (মেট্রিক টন)	শতকরা হার	নিরুপিত উৎপাদন কেজি/ হেক্টর/ বৎসর
উন্মুক্ত জলাশয়				
নদী	৮৩০	১৯৯,০০০	৩৮	২৪০
বিলও হাওর	২৭২	৬২,৫০০	১২	২৩০
প্লাবন ভূমি	২,৮০০	২৩৫,৬০০	৪৫	৮৪
	৩,৯০২	৪৯৭,১০০		

উৎস মৎস বিভাগঃ ১৯৮৭

সারণী-৫ থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশের নদী ও প্লাবনভূমি প্রতি হেক্টর আয়তন এলাকা প্রায় ১০০ থেকে ২০০ কিলোগ্রাম মৎস্য উৎপাদন করে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে কৃষি উন্নয়নের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচ প্রকল্পের সম্প্রসারণ কর্মসূচী। এ সকল কর্মসূচী যেহেতু দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের জীবন ধারণের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষি উন্নয়নের জন্য নিবেদিত, তাই মৎস্য উন্নয়নের জন্য এগুলিকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের মৎস্যের প্রধান উৎস যেখান থেকে ৯৫ শতাংশ মৎস্য উৎপন্ন হয় তার উৎপাদনের পরিমান অবশ্যই হ্রাস পাবে।

উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যের গুণগত ও সংখ্যাগত মান বিভিন্ন মৎস্যের সংমিশ্রণ, বিভিন্নপ্রজাতির মৎসের প্রজননের জন্য ও অন্যান্য উপাত্তের অভাবে এই অঞ্চলের মৎস্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই ভবিষ্যতে যে কোন প্রকারের আঞ্চলিক বা জাতীয় পানি উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্য উন্নয়নের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান অবশ্য করণীয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য শিল্পের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় গুলি নিম্নরূপ ঃ-

১। প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওর প্রভৃতিতে প্রতি বৎসর পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে জলাশয়ের আয়তন ক্রমান্বয়ে কমে মৎস্য উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাছাড়া, নদীর গতি পথ পরিবর্তন, বন্যা, খরা প্রভৃতি মৎস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। দেশের মুক্ত জলাশযেগুলিতে প্রাকৃতিক নিয়মে যে সব পোনা তৈরী হয় সেগুলি বড় হতে না হতেই ধরে ফেলার ফলে মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মাছ প্রায় থাকেই না।

৩। অনেক প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন বিল হাওর ইত্যাদি শুকিয়ে যাওয়ায় সেগুলিকে ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করার ফলে মাছের বাসস্থানের পরিধি অনেক কমে গিয়েছে।

৪। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে প্লাবন ভূমিতে পানির স্থায়িত্ব কমে যাওয়ার ফলে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

৫। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছে। এই চাষের জন্য প্রচুর পানি সেচের জন্য ব্যায়িত হওয়ায় বহু জলাশয় শুকিয়ে গেছে।

৬। সমন্বিত পানি ব্যবহার ও পরিকল্পনার জন্য অন্যতম আন্ত-সংস্থা ও আন্ত-মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব রয়েছে।

৭। উন্মুক্ত জলাশয়গুলিতে মৎসের অতি সীমিত ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু মৎস্য নীতির অভাব মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায়।

৮। মৎস্য শিকারে মৎস্যের নির্দিষ্ট আকার নির্ধারণ, জালের ফাক নিয়ন্ত্রণ (মেশ সাইজ) ও মাছ ধরার নিষিদ্ধ ঋতু বা সময় প্রভৃতির উপর যে সীমিত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক নয়।

৯। কৃষিতে ফলন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে ব্যাপকহারে রাসায়নিক সার ও কীট নাশক ব্যবহার হরা হয় তাতেও বহু মাছ মারা যায়। এতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য নষ্ট হয়

এবং মাছের মড়ক ঘটায়। অনেক ক্ষেত্রে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়।

১০। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল অঞ্চলে উপকূলীয় বাঁধের মাধ্যমে লবনাক্ত পানির হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে গিয়ে মাছের প্রজনন ও খাদ্য সরবরাহে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে।

১১। কল-কারকানা ও শহরের পরিত্যক্ত নোংরা, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি নদী বা জলাশয়ে ফেলে দেয়ার ফলে শুধু যে মাছের মড়কই ঘটাচ্ছে তা নয় মাছের খাদ্যসহ পরিবেশও ধ্বংস হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ নারায়নগঞ্জে শীতলক্ষ্যা, ঢাকার বুড়িগঙ্গা ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে মৎস্যের পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

১২। উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যের অত্যন্ত স্বল্প পরিমান তথ্য ও উপাত্তের জন্য পানির অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত সমস্যার পরিধি চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন। তাই প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩। বিভিন্ন সময়ে জলাশয়ের মালিকানার সমস্যাও মৎস্য উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। দেশে যে অসংখ্য বদ্ধ জলাশয়, মজাপুকুর, ডোবা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলির মান্যেয়নের জন্য এখনও সরকারী কিংবা বেসরকারী পর্যায়ে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয় নি।

১৪। নদী খাল সংস্কার ও বাঁধ নির্মাণের ভুল সংশোধনের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সহায়ক হবে।

১৫। এছাড়া মজাদীঘি, পুকুর সংস্কার করে মাছের চাষের জন্য সুষ্ঠু নিয়মে ঋণ দানের বিষয় বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে।

১৬। মৎস্য জলা বার্ষিক ভিত্তিতে ইজারা দেওয়ার নীতি বদল করে জলমহালগুলি স্থায়ীভাবে প্রকৃত জেলেদের হাতে দিলে অবস্থার উন্নতি আশা করা যায়।

১৭। কৃত্রিম উপায়ে মাছের পোনা তৈরী করে মাছ চাষ করলে মৎস্যের উৎপাদন বাড়বে।

১৮। বাংলাদেশের মৎস্যজীবীর অধিকাংশই অশিক্ষিত। আধুনিক মৎস্য চাষাবাদ, মৎস্য ধরার উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয় বলে এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯। মাছ অত্যন্ত পচনশীল পণ্য। অথচ আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের চাষ এবং মাছ ধরা ব্যহত হয়।

২০। মৎস্য বাজারজাত করণের নানা অসুবিধা রয়েছে। পরিবহনের অব্যবস্থা, মৎস্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে দালালদের উপস্থিতি, সংরক্ষণ, বন্টন প্রভৃতির অপর্যাপ্ত সুবিধার দরুণ আমাদের গরীব ও সরল মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়।

২১। আমাদের দেশে এখনও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রণোদিত লোকে সমন্বয় গঠিত উপযুক্ত সংগঠনের অভাব রয়েছে। তাছাড়া, মাছ ও পোনামাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ ও অনুকরনীয় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

২২। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুকুরের আকার আয়তন ও গভীরতা বিজ্ঞান সম্মত নয় এবং সেগুলিতে পানি নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। অধিকন্তু পুকুরগুলি প্রায়ই বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত বলে সেখানে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং আহরিত মাছ ঠিকমত বিক্রয় করা সম্ভব হয় না।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের উপায় সমূহঃ-

অতীতে অবহেলিত এবং বর্তমানে নানা সমস্যা জর্জরিত এ খাতকে একটি শক্তিশালী খাতে পরিণত করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা একান্ত দরকারঃ-

১। উপরে উল্লিখিত মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সামাধানই মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রধান উপায়।

২। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য মৎস্য উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মৎস্য চাষ পদ্ধতি, মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩। ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা এবং এদের প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল সম্পর্কিত মৎস্য সংরক্ষণ বিধি সমূহ পালনে জনসাধারণকে বাধ্য ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে

বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সংস্কার, প্রচার ও প্রয়োগ অভিযান পরিচালনা করা দরকার।

৪। প্রজননের জন্যে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান মাছের প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে রক্ষাস্থান ঘোষণা করে ঐগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। দেশের অসংখ্য পুকুর-পুষ্করিণীতে মাছের চাষ করতে হবে। পল্লীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক, নারী, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত সমবায়ের মাধ্যমে খাস পুকুরগুলির সুষ্ঠুতম ব্যবহার করে সেখানে মৎস্য জীবীদেরকে মৎস্য চাষের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। মৎস্যের বংশ বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে সরকারী খামারগুলির উন্নয়ন সাধন এবং এখানে বেসরকারী উদ্যাগ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

সামুদ্রিক মৎস্য সমপদের উৎপান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ-

১। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রচালিত নৌকা, লঞ্চ ও ট্রলারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এগুলির যথার্থ ব্যবহারের প্রয়োগ বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। মৎস্যজীবীদেরকে মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের জাল ইত্যাদি স্বল্প দামে বা কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য সুবিধায় সরবরাহ করতে হবে।

২। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী সহীসোপানস্থ মৎস্য ও চিংড়ির সুপরিচিত অবস্থানগুলি ব্যহারের জন্য সকল আবহাওয়া উপযোগী ট্রলার, বিশেষতঃ মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার সম্বলিত ট্রলার চালু করতে হবে। একই সাথে সমুদ্র উপকূল ব্যাপী মাছের বাজার, হিমাগার, বরফকল, মেরামত সুবিধা, তেল সরবরাহ, নৈশ নৌ চলাচলের নিরাপত্তাসহ আনুসঙ্গিক সাজ সরঞ্জাম সমৃদ্ধ মৎস্য বন্দর জেটির ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন।

৩। ধৃত মৎস্য দ্রুত বাজারজাত করনের জন্য মৎস্য বন্দরের সংগে বিভিন্ন প্রকারে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

মৎস্য বিষয়ক পরিকল্পনা ও লক্ষ্য

গত তিনটি পরিকল্পনার অধীনে মৎস্য সম্পদের উৎপাদনের হার শতকরা ২ ভাগের কম ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ১৯৮৯-৯০ সনে ১০ লক্ষ টন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রত্যাশিত অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৪৭ লক্ষ মেঃ টন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্য এবং কৌশল সংক্ষেপে আলোচিত হোল।

দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ব্যবধান ছিল।

সারণীঃ ৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন

	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৪-৮৫)	প্রকৃত উৎপাদন (১৯৮৪-৮৫)
মৎস উৎপাদন (লক্ষ টন)	১০.০০	৭.৭৪
আভ্যন্তরীণ (লক্ষ টন)	৮.২০	৫.৮৮
সামুদ্রিক (লক্ষ টন)	১.৮০	১.৮৬
মৎস্য চাষ (লক্ষ একর)	৬.৪৪	২.২১
মৎস্য রপ্তানী (টন)	২০,১০০	২৩,৩৮২
চিংড়ি	১৭,০০০	১২,৬৮০
ব্যাংগের পা	১,৬০০	১,৩৬৫
মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য	১,৫০০	৬,৩৩৭

উৎসঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ সরকার।

যদিও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি কিন্তু উৎপাদনের ধারা ছিল উর্ধমুখী। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে (১৯৮৯-৮০) লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ ঃ

১। ১৯৮৪-৮৫ সালের উৎপাদনের পরিমন ৭.৭৪ লক্ষ টন থেকে ১০.০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা (৭.৭২লক্ষ টন অভ্যন্তরীণ এবং ২.২৮ লক্ষ টন সামুদ্রিক)।

২। চিংড়ি রফতানির পরিমান ৩০,০০০ টন, ব্যাংগের পা ২,০০০ টন এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যের পরিমান ৬,০০০ টনে উন্নীত করা।

৩। ১৯৯০ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫

সারণী -৭

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় বরাদ্দের বিভিন্ন খাতের মধ্যে বন্টন ঃ-

	কর্মসূচীর নাম	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১।	জরিপ অনুসন্ধান, সম্ভাব্যতা যাচাই ও গবেষণা	৫৬.০০
২।	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কমুনিটি ডেভলপমেন্ট	১২৫.০০
৩।	মৎস্য চাষ ও উন্নয়ন	৫১২.০০
৪।	মৎস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত করণ ও বন্টন সুবিধা	৪২.০০
৫।	নুতন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ	১৪.০০
	সর্ব মোট	৭৪৯.০০

সারণী-৮

ওপরোক্ত বরাদ্দের আলোকে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধার্য্যকৃতঃ-

উৎপাদনের উৎস	১৯৮৯-৯০	১৯৯৪-৯৫
(ক) অভ্যন্তরীণ মৎস	৬১২.৫০	৯৩৮.০০
(১) পুকুর	১৬১.০০	৩০৮.৯০
(২) বাওড়	১.৫০	৫.৫০
(৩) উপকূলীয় এলাকা	২৭.০০	৮১.০০
(৪) নদী ও মোহনা	১৯০.০০	২১০.০০
(৫) বিল ও হাওড়	৫০.০০	৬৭.০০
(৬) কাপ্তাই লেক	৫.০০	৭.৫০
(৭) প্লাবন ভূমি	১৭৮.০০	২৩৭.৫০
(৮) চাষাধীন এলাকা	—	২০.০০
(খ) সামুদ্রিক মৎস	২৩৪.৫০	২৬২.০০
(ক+খ) সর্বমোট	৮৪৭.০০	১২০০.০০

উৎসঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (খসড়া)।

সারণী-৯

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে প্রকৃত উৎপাদন এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

উৎপাদনের উৎস	প্রকৃত উৎপাদন ১৯৮৪–৮৫ (হাজার টনে)	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৯–৯০ (হাজার টনে)
অভ্যন্তরীণ মৎস্য	৫৮৮.৪	৭৭২.৪
পুকুর	১২৫.৫	১৯২.০
হাওর	১.১	২.৮
উপকূলীয় মৎস্যচাষ	৯.০	৩৪.২
নদী ও খাড়ি	২০৭.১	২০৫.৪
বিল ও হাওর	৫১.৭	৭৫.০
কাপ্তাই হ্রদ	৫.০	৮.০
প্লাবন ভূমি	২০২.০	২১০.০
সামুদ্রিক	১৮৫.৬	২২৮.০
মোট	৭৭৪.০	১০০০.৪

উৎসঃ পূর্বোক্ত

সারণী-১০

মৎসজাত দ্রব্যাদি থেকে রপ্তানি আয়

রপ্তানিকৃত দ্রব্য	১৯৮৪–৮৫ পরিমাণ মেট্রিক টন/মূল্য		১৯৮৯–৯০ পরিমাণমেট্রিক টন/মূল্য	
	মেট্রিক টন	কোটি টাকা	মেট্রিক টন	কোটি টাকা
চিংড়ি	১২,৬৮০	১৯৯.৪৫	৩০,০০০	৫০০.০
মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য	৬,৩৩৭	২১.০৯	৬,০০০	৩০,০
ব্যাংগের পা	১,৩৬৫	১০.২৭	২,০০০	২.৪০
মোট	২০,৩৮২	২৩০,৮৯	৩৮,০০০	৫৩২,৪০

সারণী–১০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৪–৮৫ সালে প্রকৃত মৎস্য রফতানির পরিমান এবং তা থেকে আয় পরবর্তী ৫ বছরে অর্থ্যৎ ১৯৮৯–৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় অর্ধেক ছিল। দেশের বর্তমান আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন খুবই কষ্টসাধ্য হবে।

মৎস্য রোগের কারণ ও প্রতিকার

বাংলাদেশে মৎস্য রোগের কারণ প্রধানতঃ (ক) পরিবেশগত এবং (খ) জীবানু গঠিত এই দুই প্রকার।

ক) **পরিবেশগত কারণ সমূহ**

পরিবেশগত অসুবিধায় মাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, মাছ দূর্বল থেকে দূর্বলতর হয়ে রোগাক্রান্ত হয় এমনকি মৃত্যুবরণ করে থাকে কোন কোন সময়। আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় এমন অসুবিধার মধ্যে ঃ

(১) **অক্সিজেন জনিত ঃ**– উৎপাদনশীল স্বাভাবিক পানিতে দ্রবভূীত অক্সিজেন এর পরিমনি ৮.৬–১১.৫ মিঃগ্রামঃ/লিটার থাকার কথা[১]। কোন কারণে এই মাত্রা যদি খুব কমে যায় তবে মাছের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। মাছ এই দ্রবভূীত অক্সিজেন শ্বাসপ্রশ্বাসে ব্যবহার করে বেঁচে থাকে। আবার মাছের অক্সিজেন গ্রহণের মাত্রাও পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভব করে কমবেশী হতে পারে। যে মাছ ১৫ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ৪৩.৫ মিঃ গ্রামঃ অক্সিজেন গ্রহণ করে, আবার সেই মাছই ৩০ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ২১৬ মিঃ গ্রাম গ্রহণ করে[২]।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই পুকুরে অক্সিজেন য়এর ঘাটতি দেখা দিলে মাছের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মাছ উলট পালট করে চলে এবং পানির উপর ভেসে খাবি খায় এমনকি মারা যেতে পারে। এই অবস্থা হলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমান বাড়াতে হবে। পানিতে বাঁশ পিটিয়ে বা ছেলে মেয়েদের সাঁতার কাটিয়ে অথবা আধুনিক এয়ারেটার ব্যবহার করে অক্সিজেনের বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে।

(২) **কার্বন–ডাই–অক্সাইড জনিতঃ** যে সব জলাশয়ে দিনের বেলায় ফটোসিনথেসিসের ফলে কার্বন–ডাই–অক্সাইড এবং কার্বনিক এসিড দূর না হয়, সে সকল জলাশয়ে কাবর্ন–ডাই–অক্সাইড জনিত বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থার সৃষ্টি হয়

---

১ ও ২. ডঃ ইসলাম, মাছের রোগ, ৪৮ পৃষ্ঠা।

সাধারণতঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এবং জলাশয়ে পঁচা কিংবা পঁচনশীল জলজ উদ্ভিদের আধিক্য থাকলে। ফটোসিনথেসিস বাধাগ্রস্থ হওয়ায় অক্সিজেনরও ঘাটতি দেখা যায়। অক্সিজেনের ঘাটতি জনিত কারণে মাছ ভেসে উঠে শ্বাস প্রস্বাস ঘন ঘন নিয়ে থাকে এবং ভারসাম্য হারিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পানির উপরে উঠে আসে। যেহেতু পি, এইচ, বাড়ালে কার্বন–ডাই–অক্সাইড কমে সেহেতু চুন প্রয়োগে পি, এইচ, মান বাড়াতে পারলে সমস্যা দূর হতে পারে।

(৩) **লৌহ জনিতঃ** পানিতে যদি লৌহের পরিমান বেড়ে যায় তবে জমাট হাইড্রক্সাইড অবস্থায় তা মাছের ফুলকায় বসে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটায়। যখন পানির পি, এইচ, ৬.৫–৭.৫ এর মধ্যে থাকে তখন যদি প্রতি লিটার পানিতে ০.৯ মিঃ গ্রাঃ লৌহ থাকে তবে মাছ মারা যেতে পারে। এই সমস্যার সমাধানের সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পন্থা তেমন একটা নেই তবে চুন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

(৪) **অত্যধিক উদ্ভিদ জনিতঃ** পানিতে অতি মাত্রায় উদ্ভিদ থাকলে সেখানে রাত্রে এত কার্বন–ডাই অক্সাইড তৈরী হয় যে, পানির পি, এইচ, মান ৫.০ এর নীচে নেমে যেতে পারে। আবার পরিষ্কার দিনে এতই অক্সিজেন তৈরী হয় যে পানির পি, এইচ মান ৮.৫ বা তার অনেক উপরে উঠে। এই উভয় অবস্থা মাছের জন্য ক্ষতিকর, এবং মাছের মৃত্যুর কারণ। আগাছা দমনকারী ঔষধ প্রয়োগ অথবা যে কোন উপায়ে এই উদ্ভিদকে বাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণে রাখাই এর সমাধান [৩]।

(৫) **পুকুরের তলদেশে সৃষ্ট বিষাক্ত গ্যাস ঃ**– এই ক্ষেত্রে এক নম্বর অসুবিধার মতই লক্ষণ দেখা যাবে। তবে এই গ্যাস সৃষ্টি হলে ইট বা শক্ত কোন কিছু পুকুরের তলায় ছুড়ে ফেললে বুদ বুদ উঠবে এবং মাটি দুর্গন্দময় হবে। এই অবস্থায় কোন কোন সময় মাছ মারা যেতে পারে। প্রতিকার হিসাবে রৌদ্রের সময় পুকুরে হররা টেনে অথবা বিঘাপ্রতি ১/২ মন চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) জীবানু ঘটিত কারণ সমূহ

পানিতে মাছ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির কীট ও জীবানুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত মাছে যে সব লক্ষণ দেখা যায় তার প্রতিকার সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হোলঃ–

---

৩. মৎস্য খামার স্থাপন ও ব্যাস্থাপনা–৬১ পৃষ্ঠা।

(১) **ড্রপসিঃ**- মানুষের ডাইরিয়া সদৃশ এই রোগ, মাছের পুকুরে পরিবেশ অপরিস্কার থাকা, অনুপযোগী খাবার প্রদান ইত্যাদি কারণে দেখা দিতে পারে এবং ইহা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহামারী আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় আক্রান্ত মাছ অনবরত পায়খানা ও বমি করতে থাকে। রং ফেকাশে দেখায় , একা একা উলটে পালটে চলা, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত মাছকে অন্যত্র সরিয়ে পুকুর থেকে পানি সেচে নতুন পানি ঢুকাতে হবে অথবা ০.৫ নিযুতাংশ ডিপটারেক্স প্রয়োগ করে পুকুরটি রোগ মুক্ত করে পুনরায় মাছকে ঐ পুকুরে ছেড়ে যত্ন নিলে সুস্থ্য হয়ে উঠবে। আক্রান্ত মাছকে ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকসন দিয়ে (মাংসে) সুফল পাওয়া যায় [৪]।

(২) **বসন্ত ঃ**- মানুষের মত মাছেরও বসন্ত হয় এবং তা হলে মাছকে দুর্বল দেখায়, সাদা গোলাকার ঘা সৃষ্টি হয়, গতি কমে আসে এবং একা একা উলটে পালটে চলে। তাছাড়া স্বাভাবিক রং বদলে যায়। প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত মাছকে ৩% লবন জলে ৪/৫ মিনিট গোসল করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে অথবা পুকুরটি ০.৫ নিযুতাংশ ডিপটারেক্স প্রয়োগে রোগ জীবানু মুক্ত করে আক্রান্ত মাছকে পুনরায় ঐ পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

(৩) **মাছের উকুন ঃ**- পরিবেশ অপরিষ্কার কিংবা বাইরের রোগের জীবানু পুকুরে ঢুকলে মাছ উকুনে আক্রান্ত হয়। আরগুলাস নামক এই উকুন আক্রান্ত মাছের গা থেকে রক্ত শোষণ করে মাছকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলে। আক্রান্ত মাছ মন্থর গতিতে পুকুরের উপরিভাগে বিচরণ করে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে যখন পুকুরের পানির স্তর নেমে আসে তখনই উকুনের আক্রমণ ব্যাপক হলে তা মহামারী আকারে দেখা দেয়। বাংলাদেশে চাষ করা মাছে উকুনই সব চাইতে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। আক্রান্ত পুকুরে ৫ নিযুতাংশ হারে ডিপটারেক্স ব্যবহার করে মহামারী রোধ করা সম্ভব।

(৪) **পাখনা পঁচা রোগ ঃ**- এই রোগে মাছের পাখনা পঁচে যায় এবং অন্যান্য লক্ষণ বসন্তের মতই। প্রতিকার হিসাবে বসন্তের ব্যবস্থাই এখানে সুফল দেবে।

(৫) **আইস উঠা রোগ ঃ**- এই রোগে মাছের আইস উঠে যায় এবং অন্যান্য লক্ষণ বসন্তের মতই। প্রতিকার হিসাবে বসন্তের ব্যবস্থাই এখানেও সুফল দেবে।

---

৪. পি, তেন, ডুইজন এর (১৯৭৩) ডিজিজেজ অব ফিসেস্- পৃষ্ঠা-১৭০

(৬) **ফুলকা পঁচা রোগঃ**– মারাঅক রোগ। সাইকোমাইসেটিস জাতীয় ছত্রাক দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি। এই রোগে ফুলকার অংশ রক্তনালী থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং পঁচে খসে পড়ে। অক্সিজেন নিতে না পেরে মাছ মারা যায়। এই অবস্থায় পুকুরে ০.৫ নিযুতাংশ ডিপটারক্স অথবা মেলাকাইটগ্রীণ ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত মাছকে ২.৫% লবন জলে গোসল করাতে হবে[৫]।

(৭) **জোক ঃ**– মাছের গায়ে লেগে থেকে রক্ত খেয়ে মাছকে দুর্বল করে ফেলে এবং আহত জায়গায় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে নতুন রোগ সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় আক্রান্ত মাছকে পুকুরের বাইরে এনে ২.৫% লবন জলে গোসল দিতে হবে।

(৮) **এ্যানেমিয়াঃ**– খাবারে ভিটামিন যেমন বইয়োপ্লোরিন, পেন্টাথেনিক এসিড, পাইরিডোক্রিম ইত্যাদির অভাবে এই রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত মাছের ফুলকা ফেঁকাশে বা বাদামী হয়ে যায় এবং মাছের মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত মাছের চিকিৎসা হিসাবে মাছের খাবারের সাথে ভিটামিন সমূহ খাইয়ে দিলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

(৯) **সেপ্রলেগনিয়া ঃ**– প্রজননের পর মাছের ডিম ফোটাবার সময় এই রোগ দেখা দেয়। যে সব ডিম মরে যায় এই রোগ ঐ ডিমেই বেশী সৃষ্টি হয় যা পরক্ষণেই ভাল ডিমকে আক্রমণ করে। ডিম ফোটানোর সময় মরা ডিম ও ডিমের খোলস ঘন ঘন সরিয়ে ফেললে সুফল পাওয়া যায়।

(১০) **ইপিজুটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম বা ক্ষত রোগঃ**– ক্ষত রোগ বর্তমানে বাংলাদেসে মৎস্য সম্পদের নিকট হুমকি স্বরূপ। তাই এর ইতিহাস, সম্ভাব্য কারণ, লক্ষণ আর প্রতিকার কিম্বা বিস্তার সম্ভাব্যতা নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। সংক্ষিপ্তভাবে নিচে এই রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হোল ঃ–

রোগ বিস্তারের ইতিহাস

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাছের এই কঠিন সংক্রামক ক্ষতরোগ বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইহা প্রথম ১৯৭২ সনে অষ্ট্রেলিয়ায়, ১৯৭৫–৭৬ সনে পাপুয়া নিউ গিনি, ১৯৮০ সালে ইন্দোনেশিয়া, ১৯৮০–৮৫ সালে থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে এবং ১৯৮৪ সনে বার্মায় বিস্তার লাভ করে। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি নদ–নদী এমনকি খান বিলেও মহামারী রূপে দেখা দেয় ।

---

৫. মৎস্য খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা (১৯৮৭)–৬৩ পৃষ্ঠা

এই আলসারেটিভ রোগটির সঠিক কারণ এখনো নির্ণীত হয় নাই। ১৯৮৬ সনে ক্ষতিগ্রস্ত ক'টি দেশের বিশেষজ্ঞদের এক সেমিনারে সিদ্ধান্ত হয় যে আধা লোনা হতে মিঠা মাছ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মিঃ রাজ এটাকে রেবডোভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ময়মনসিংহ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাগার পরীক্ষায় কৃষি জমিতে অতি মাত্রায় সার ও কীট নাশক দ্রব্যের ব্যবহারে সৃষ্ট পরিবেশ ও ভারসাম্যহীনতাকে এই রোগের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। যে সকল কীট নাশক পানিতে অদ্রবনীয় বিষাক্ত অনু থাকে সে সকল কীট নাশক ব্যবহারে ঐ বিষাক্ত অনুগুলি দিনের পর দিন পানিতে জমতেই থাকে এবং মাছের বাসযোগ্য পরিবেশ বিনষ্ট করে থাকে। সার ও কীট নাশকেই হোক বা অন্য ভাবেই হোক এটা যে পানিতে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা থেকে সৃষ্ট তা সবাই স্বীকার করেন।[৬]

রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণঃ এই আলসারেটিভ বা ক্ষত পচারোগে আক্রান্ত মাছে প্রথমে ঘাড়ের নিকটে ও পরে সারা দেহে ফোলা লালচে গুটি দেখা যায় এবং ক্রমান্বয়ে তা হলদে হয়ে ভাসা থেকে গভীরতর ঘা এর সৃষ্টি করে থাকে। আর এই ঘা আবার হাড়ে ও দেখা দিতে পারে।আক্রান্ত মাছ শ্বাস কষ্টে ভোগে এবং ভাসতে ভাসতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একক থেকে মহামারী আকারে মারা যায়।[৭]

প্রতিকার ও প্রতিরোধঃ-

সংক্রামক ও দুরারোগ্য এই আলসারেটিভ বা ক্ষত রোগের সফল চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে পরিবেশ ও মাছের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় পানির পি, এইচ, মান অনুযায়ী প্রতি ডেসিমেলে কম/বেশী ১ কেজি চুন ব্যবহার ও পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এই রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে।

---

৬. **মৎস্য খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা** (১৯৮৭-৬৩) পৃষ্ঠা।

৭. মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত— **বাংলাদেশে মাছের ক্ষতরোগঃ** ডঃ নুরুজ্জামান এর ২রা জুন ১৯৮৮ এর বাংলাদেশ অবজার্ভার এ প্রকাশিত নিবন্ধ; ডঃ এম, এ, ওহাব এর ৯ই আগষ্ট, ১৯৮৮ তারিখে 'নিউ নেশান' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ; ৬ ই এপ্রিল, ১৯৮৮ জেলা মৎস্য দপ্তর মৌলভীবাজার থেকে প্রকাশিত—**আলচারেটিভ বা পঁচা রোগ পুস্তিকা।**

রোগের বিস্তার সম্ভাব্যতাঃ

বাংলাদেশে সাগর মোহনা অঞ্চল থেকে শুরু করে সারাদেশে এর বিস্তার সম্ভাব্যতা আছে। আর ছোট বড় সকল ধরনের মাছই অল্প বিস্তর এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

(৬) বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও প্রজাতি ঃ-

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে কয়েকটি জেলায় যেমন চাঁদপুর, ভোলা, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে এবং পরবর্তীতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলা যেমন সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা জেলায় একই বছর জুন মাসে দেখা দেয় বলে মৎস্য বিভাগীয় পরিচালক তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি, মাগুর, শিং, বাইন, টেংরা মারাত্মকভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রুই-কাতলাও আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে।

মৎস্য রোগ প্রতিরোধ কল্পে জলাশয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে জীবানুর বংশ বিস্তারের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টির সুযোগ না থাকে। বাইরে থেকে পানি প্রবেশ করতে না দিয়ে বাইরের রোগ জীবানুর অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে; বিষাক্ত দ্রব্যাদি যাতে পুকুরে না পড়ে তারও ব্যবস্থা নিতে হবে; কৃষি জমিতে নির্বাচিত কীট নাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সর্বোপরি রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে তার প্রতিকারের মাধ্যমে পরবর্তী বিস্তার রোধ করতে হবে[৮]।

জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ-

মৎস্য রোগ সংক্রান্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা- নিরীক্ষা, সুপারিশ ও নীতি মালা প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে এগুলোর বাস্তবায়ন কাজ সফল করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পর্যায়ে ট্রাস্কফোর্স গঠন করেছেন। এতদ্ভিন্ন উন্মুক্ত জলাশয় অর্থাৎ নদীতে পোনামাছ ছাড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

---

৮ মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আমসান উল্লাহ এবং উক্ত অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক ও ৮ম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী জনাব শামসুদ্দিন এর সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুপারিশ মালাঃ-

মৎস্য রোগ প্রতিকার শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত বিষয়াদির প্রেক্ষিতে নিম্নের সুপারিশ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ—

(১) পুকুরে পানির পি, এইচ, মাছ আশানুরূপ পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ ;

(২) বাইরে থেকে যাতে রোগ জীবানু পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া ;

(৩) পুকুরে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;

(৪) পুকুরের পানি যাতে দুষিত না হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা ;

(৫) উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত সংখ্যক মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা নেওয়া ;

(৬) আক্রান্ত মাছকে শতকরা ২.৫ ভাগ লবন জলে ৪/৫ মিনিট গোছল দেওয়া ;

(৭) মুক্ত জলা সহ সকল জলাশয় থেকে রোগাক্রান্ত মরা মাছ তাৎক্ষণিক তুলে মাটিতে পুতে ফেলা।

উপসংহারঃ-

জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণে মৎস্য সম্পদ খুবই সহায়ক এবং এই দেশ নদী মাতৃক বিধায় মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রচুর। জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৫ভাগ ও রপ্তানি আয়ের ১১ ভাগ এই উপখাত থেকে আসে। এই দেশের জনগণের অতি প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষ খাদ্যে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী আসে মাছ থেকে। এখানকার খাল, বিল, পুকুর, দীর্ঘ হাওর, নদী, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও খাড়ি অঞ্চলে মোট জলাশয়ের পরিমাণ ১,০৮,০২,২০০ একর। ওপরোক্ত জলাশয় সমূহে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধান, খাদ্য ঘাটতি পূরণ এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মুক্তির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রে উৎপাদন ৭২০ হাজার মেট্রিক

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

টন থেকে ৫৯৭ হাজার মেট্রিক টনে এসেছে অর্থাৎ গত ২০ (বিশ) বৎসরে মৎস্য ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রযুক্তি প্রয়োগের পরও ১৯৬৫–৬৬ সালের তুলনায় ১৯৮৬–৮৭ সালে ১২৩ হাজার মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ মৎস কম উৎপাদিত হয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র একত্রে এই উৎপাদন গত ২০ বৎসরে ৮০১ হাজার মেট্রিক টন থেকে ৮১৪ হাজার মেট্রিক টনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সামুদ্রিক মৎস ক্ষেত্রের উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবী করা হলেও গত ২০ বৎসরে মাত্র ১৩ মেঃ টন বেড়েছে।

অপরদিকে জনপ্রতি মৎস্য খাবারের পরিমাণ ১০৬৫–৬৬ সালে ছিল ৩৩ গ্রাম, ১৯৭৯–৮০ সালে তা কমে আসে ২০ গ্রামে এবং ১৯৮৬–৮৭ সালে সামান্য বেড়ে প্রায় ২২ গ্রামে এসে দাঁড়ায়। মৎস্যের উৎপাদন এবং মাথাপিছু মৎস্য ব্যবহারের পরিমাণের প্রবণতা যদি ক্রমান্বয়ে এইভাবে কমতে থাকে তাহলে বাংলাদেশের মৎস্য এবং মৎস্য জাত সামগ্রী আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আদৌ পাবে কিনা সন্দেহ।

প্রকৃতির এমন উদার অবদান সত্ত্বেও মৎস্য উৎপাদনে আমরা আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে পারছিনা। সরকারী সুষ্ঠু মৎস্য নীতি প্রণয়ন এবং অনুসৃত নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে শুধু দেশের চাহিদা মেটানো নয়– চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশে বপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হবে। তাহলেই দেশে বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। মাহবুব হাসন, **প্রকৃতি ও সম্পদ**, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা (১৯৮৫)১৮৪–২০২।

২। পরিকল্পনা মন্ত্রাণালয়, **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকলপনা**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা (১৯৮৬), পৃঃ ২০৮–২১৫।

৩। প্লানিং কমিশন, **ইকোনিমিক রিভিউ ১৯৮৬-৮৭**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,ঢাকা (১৯৮৮), পৃঃ ৫১–৫৩।

৪। অর্থ মন্ত্রণালয়, **বাংলাদেশ অর্থনেতিক জরীপ ১৯৮৭-৮৮**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা (১৯৮৯), পৃঃ ২৯–৪০।

৫। বাংলাদেশ ব্যুরো ষ্ট্যাটিসটিক্স, **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৭-৮৮**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা (১৯৮৮)।

৬। বাংলাদেশ ব্যুরো অব ষ্টাটিসটিকস, **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯।

৭। মৎস অধিদপ্তর, **মৎস খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা,** ঢাকা (১৯৮৭), পৃঃ ৬৯।

৮। ডঃ ইসলাম, **মাছের রোগ,** ঢাকা,পৃঃ ৪৮।

৯। ডঃ সুভাষ চন্দ্র দাস, "ম্যস সম্পদ" **ভুলোগ পত্রিকা, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা** (১৯৮৬–৮৭), পৃঃ ১৬–৩২।

১০। পি, ভেন, ডুইজন, **ডিজিজেস অব ফিসেস।**

১১। সিরাজুল ইসলাম, চৌধুরী, **অর্থনৈতিক ভূগোল ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৮)।

১২। প্লানিং কমিশন, **মাষ্টার প্লান অর্গানাইজেশন** (এমপিও) ১৯৮৪, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০–৯৫।